**ISSN 1605-2021**

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

# বাংলাদেশে পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এস, এম, জুবায়ের এনামুল করিম *

**Comparative Analysis of Family Welfare Programmers of Bangladesh.** S. M. Zobayer Enamul Karim

**Abstract :** Bangladesh is one of the most densely populated countries of the World. Our resources are scarce compare to the needs of population. Hence, it is very difficult to meet the basic needs of the people and to develop their physical and mental capability. An attempt has been made to analyse the family planning programmers of Bangladesh undertaken and implemented from 1953. Major variables analysed in this paper cover: structure for rendering family planning service, mother & child health care, management for input supply for birth control, information management, monitoring and evaluation process of family planning programme. The analysis reveals strong political commitments by all successive governments, policy consistency of family planning programmes and strategies, supportive attitude of religious leaders, effective coordination among personnel of diverse government agencies and field workers, female education, mass media campaign are the major contributing factors for the success of family planning programmes. The success of the family planning programmes mostly depends on the effective participation of people. Future policies and programmes may be formulated based onthe success learning of the past family planning programmes.

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ঘনবসিতপূর্ণ দেশ। জনসংখ্যার এ বিরাট অংশের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের জন্য দেশের প্রশাসনকে প্রতিনিয়ত যথেষ্ট হীম-সীশ খেতে হচ্ছে। কেননা, জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের প্রাপ্ত সম্পদের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। সম্পদ ও জনসংখ্যার এ ভারসাম্যহীনতার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক ও রাজনৈতিক

---

* সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

বিশৃংখলা এবং সর্বোপরি প্রত্যাশিত উন্নয়ন দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জনসংখ্যার তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতা বৈদেশিক নির্ভরতাকে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়ে তুলছে; এ অবস্থা ক্রমাগতভাবে চলতে থাকলে জাতি হিসেবে আমাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একদিন রহিত হবে এবং অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়াও মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও আমাদের প্রচেষ্টা একেবারে কম ছিল না। সরকার এ বিষয়টিকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, সমাধানের পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করেছে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে পরিকল্পিত পরিবার গঠন তথা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ও তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাপ্ত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে কয়েকজন দূরদর্শী ও নিবেদিত প্রাণ সমাজসেবকের মহতী প্রচেষ্টায় এদেশে সরকারী পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকান্ডের সূচনা হয়। এ প্রবন্ধে ১৯৫৩ সাল থেকে অদ্যাবধি সরকারীভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে ১১টি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ পর্যায়গুলো উল্লেখ করা হলো ঃ

**প্রথম পর্যায় ঃ বেসরকারী ক্লিনিকভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৫৩-৬০)**

১৯৫৩ সালে কিছু সমাজ সচেতন, প্রগতিশীল ও মানব হিতৈষীদের প্রচেষ্টায় জনসংখ্যা কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। বেসরকারী উদ্যোগে গঠিত হয় পরিবার পরিকল্পন সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি বড় বড় শহরগুলোতে ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে; জনগণকে অবহিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরিবার পরিকল্পনা সমিতি 'সুখী জীবন' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে।

তৎকালীন সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে (১৯৫৫-৬০) বেসরকারী উদ্যোগে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৫ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)।

**দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ক্লিনিকভিত্তিক সরকারী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৬০-৬৫)**

স্বাধীনতাপূর্ব ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে তৎকালীন সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩০.৫ মিলিয়ন রূপী বরাদ্দ করে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)। এ সময়ে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে স্বাস্থ্য সার্ভিসের অংশ হিসাবে সম্পৃক্ত করা হয় এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, যেমনঃ হাসপাতাল, ডিসপেনসারী এবং ক্লিনিকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী হিসেবে শুধু কনডম বিতরণ করা হয়।

**তৃতীয় পর্যায় ঃ মাঠভিত্তিক স্বায়ত্তশাসিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৬৫-৭০)**

এ কার্যক্রমকে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পূর্বকালীন পর্যায় হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। ১৯৬৫ সালে সরকারী পর্যায়ে জোরদারভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং জনসংখ্যা কার্যক্রমের জন্য ১৬৬ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়; কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন করা হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে গঠিত বোর্ডের ওপর সার্বিক কার্যক্রমের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং এ দায়িত্ব একজন পরিচালকের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জেলা পর্যায়ে একজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (স্নাতক ডিগ্রিধারী) এবং ক্লিনিক্যাল সেবা কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য একজন জেলা টেকনিক্যাল কর্মকর্তা (মেডিক্যাল স্নাতক) নিয়োগ করা হয়। থানা পর্যায়ে একজন থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং একজন মহিলা ও ২জন পুরুষসহ মোট ৩ জন সহকারী নিয়োগ করা হয়। থানা পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়। গ্রাম পর্যায়ে ১৫ টাকা বেতনে স্বেচ্ছাভিত্তিক খন্ডকালীন দাই নিয়োগ করা হয়। তাদের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের উদ্বুদ্ধকরণ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়; ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩০ টাকা মাসিক বেতনে স্বেচ্ছাভিত্তিক CMO (Chief Male Organiser) নিয়োগ করা হয়। স্থানীয় হকার, দোকানদার, চৌকিদার ও গ্রাম্য চিকিৎসকদের মধ্য থেকে এদের নির্বাচন করা হয়।

জেলা এবং প্রধান প্রধান মহকুমা শহরে Urban Clinic খোলা হয়। সেখানে একজন মহিলা আরবান কাউন্সিলার ও একজন মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়, মহিলা পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শিকা নামে একটি নতুন প্যারামেডিকস ক্যাডার গঠন করা হয়, তাদেরকে আই ইউ সি ডি এবং খাবার বড়ির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়; এ সময়ে প্রচারকার্য জোরদার করা হয়।

এ পর্যায়ে স্থূল জন্মহার ৫০ থেকে কমিয়ে ৪০-এ, মৃত্যুহার ২০ থেকে কমিয়ে ১৫তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ছিল ৩.৭ (National Impact Survey) স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে ১৯৭১ সালে কার্যক্রম প্রায় বন্ধ থাকে (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)।

**চতুর্থ পর্যায় ঃ অন্তর্বর্তীকালীন সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (১৯৭২-৭৪)**

এ পর্যায় থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রম। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত থাকায় স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন বিলম্বিত হয়। পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন থাকায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে পরীক্ষামূলকভাবে ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে আলাদাভাবে পরিচালিত তিনটি Vertical Programme, যথাঃ স্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া নির্মূল ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে একীভূত করে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করা হয়; এ পর্যায়ে কর্মসূচির কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধিকে দেশ পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা দেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপরিমিত গতিকে কার্যকরভাবে রোধকল্পে প্রক্রিয়াধীন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি শক্তিশালী জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন, একটি স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামো গঠন এবং

পরিবার পরিকল্পনা সেবার সাথে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা সম্পৃক্ত করাসহ মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করার বিষয়েও সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি সাবেক সরকারের অবকাঠামো নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ ও আইইউডি প্রয়োগের আর্থিক সুবিধা (incentives) অবলুপ্ত করা হয় এবং পঞ্চাশ শতাংশ ধাত্রী ও পুরুষ সংগঠন ছাটাই করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসন ও এম আর কর্মসূচি চালু করা হয়। স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়া কার্যক্রমে নিয়োজিত ১২০০০ কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমন্বিত সেবাদান কার্যক্রমে নিয়োজিত করা হয় এবং জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৪ সালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বে স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ গঠন করা হয়। এই সময় দেশের ৩টি জেলায় (বৃহত্তর নোয়াখালী, খুলনা এবং টাংগাইল) পরীক্ষামূলকভাবে 'Motivator' নামে সার্বক্ষণিক মাঠকর্মী নিয়োগ করা হয় (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০)। এ পর্যায়ে কর্মসূচীর কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি।

**পঞ্চম পর্যায়ঃ মা ও শিশু স্বাস্থ্যভিত্তিক বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৭৫-৭৮)**

উপ-রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে ১৯৭৫ সালে গঠিত হয় প্রথম জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ। ১৯৭৫ সালে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৬ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ পুর্নগঠিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয়-স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা

বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য দুজন উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। দুটি বিভাগ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৭৭ সালের শেষ দিক পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৬ সালে পূর্ণকালীন মাঠকর্মী নিয়োগ করা হয়। প্রতি গ্রামে একজন দাইকে নিরাপদ প্রসবের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়, ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয় এবং জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট) সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭৮ সালের শেষদিক থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত 'Two Years Approach Plan' চালু করা হয়। এই পরিকল্পনায় আওতায় মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগকে সমন্বিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়।

এই সময়কালে জনমিতিক লক্ষ্যমাত্রায় স্থূল জন্মহার ৪৭ থেকে কমিয়ে ৪৩, স্থূল মৃত্যুহার ১৭ থেকে কমিয়ে ১৫, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩% থেকে কমিয়ে ২.৮%-এ এবং ১৯৮৫ সাল নাগাদ NRR-1 অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন জরীপে দেখা যায় এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭% এ (BFS-75) উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার, ২০০০, BBS, ১৯৭৮)

**ষষ্ঠ পর্যায় ঃ থানা ও নিম্ন পর্যায়ে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন (১৯৭৮-৮০)**

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) মেয়াদান্তে দু'বছর মেয়াদী (১৯৭৮-৮০) 'Two Years Approach Plan' গ্রহণ করা হয়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলঃ পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন। এ সময়কালে গৃহীত প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ ঃ

মহাপরিচালক (কর্মসূচী উন্নয়ন)- এর একটি নতুন পদ সৃষ্টি এবং পূরণ করা হয়;

বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক ও জেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক (সাধারণ ও আইইএম) ও সহকারী পরিচালক (এমসিএইচ) পদ সৃষ্টি ও পূরণ করা হয়;

থানা ও নিম্ন পর্যায়ে থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করা হয়;

স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব দু'জন সচিবের স্থলে একজন সচিবের উপর ন্যস্ত করা হয়।

এ পর্যায়ে বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭% এ নেমে আসে এবং প্রজনন হার দাঁড়ায় ৬.৫৭% (CPS-79) । পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার এ সময়ে ১২.৭ (CPS-79) এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৯)।

**সপ্তম পর্যায় ঃ সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৮০-৮৫)**

সমন্বিত কার্যক্রমের আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান মেডিক্যাল অফিসারসহ স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

একক নেতৃত্ব (Unified Command) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং এই মন্ত্রণালয়ে এক মন্ত্রী ও এক সচিবের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের আওতায় থানা ও নিম্ন পর্যায়ে Coordinated Service Delivery System চালু করা হয়।

মহাপরিচালক ও মেডিক্যাল অফিসার (ভ্রাম্যমাণ বন্ধ্যাকরণ দলগুলি) অবলুপ্ত হয়, থানা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়কে থানা পরিষদ কার্যালয় থেকে থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়; উপজেলা পদ্ধতি চালু করা হলে পরিবার পরিকল্পনা প্রশাসনকে উপজেলা পরিষদ প্রশাসনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

এ পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল স্থূল জন্মহার ৪৩ থেকে কমিয়ে ৩২-এ, স্থূল মৃত্যুহার ১৭ থেকে কমিয়ে ১৪তে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ২.৭ থেকে কমিয়ে ১.৮-এ এবং পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৪ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৮ এ উন্নীত করা। এছাড়াও, ১৯৯০. সাল নাগাদ NRR-1 অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার এ সময়ে ছিল ২.২২%-এ। স্থূলজন্ম ও মৃত্যুহার যথাক্রমে ৩৪.৬ ও ১২.০ তে নেমে এসেছে। এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর

হার ২৫.৩%-এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার ২০০০)। স্থূল জন্ম ও মৃত্যুহার যথেষ্ট কমে আসার অন্যতম কারণ হয়তোবা সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের জন্য সম্ভব হয়েছিল। এসময়ে সরকার কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য এতদসংক্রান্ত দুটি মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে এবং বিভিন্ন সমাজকর্মীদের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে ও প্রশাসনিক সংস্কারের ব্যবস্থাও এসময়ে গ্রহণ করা হয়।

**অষ্টম পর্যায় ঃ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৮৫-৯০)**
জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ সময়ে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় ইউনিয়ন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি;

থানা পর্যায়ে সাংসদদের সভাপতিত্বে গঠিত হয় থানা 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি';

উপজেলা চেয়ারম্যানদের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি';

জেলা পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠন করা হয়। 'জেলা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় জেলা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কমিটি' এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি';

কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত জনপ্রতিনিধিদল, সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং সাংসদদের মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম তদারকীতে সম্পৃক্ত করা হয়;

সেবা প্রদান অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন ও বিস্তারকরণ জোরদার করা হয়;

সুষ্ঠুভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ে এফডব্লিউএ (FWA) রেজিষ্টার প্রবর্তন করা হয়;

মাঠ পর্যায়ে সেবার প্রাপ্যতাকে আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে স্যাটেলাইট ক্লিনিক কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়;

বহুমুখী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কার্যক্রম জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার লাভ করে। ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী প্রথম বারের মত জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয় এবং প্রতি বছর দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়;

জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের কলেরব বৃদ্ধি করা হয় এবং প্রতি তিনমাস অন্তর পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়;

বেসরকারী সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ জোরদার করা হয়;

দুসন্তান বিশিষ্ট আদর্শ দম্পতিদের সম্বর্ধনা দেওয়ার রীতি প্রচলন করা হয়;

ভালো কাজের জন্য মাঠকর্মীদের পুরস্কার দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়;

সেবার মান উন্নত করার প্রয়াস নেওয়া হয়;

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেওয়ার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়;

এ সময়ে বাংলাদেশের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ পর্যায়ে স্থূল জন্মহার ৩৯ থেকে কমিয়ে ৩১ এ, স্থূলমৃত্যুহার ১৫ থেকে কমিয়ে ১৩.৪ এ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ২.৪ থেকে কমিয়ে ১.৮-এ, প্রজনন হার ৫.৬ থেকে কমিয়ে ৪.১-এ, শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ১২৫ থেকে কমিয়ে ১১০-এ, মাতৃমুত্য হার ৬ থেকে কমিয়ে ৪-এ, নবজাতক-শিশুমৃত্যু হার ৮৫ থেকে কমিয়ে ৬৫-তে (প্রতি হাজারে) এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার শতকরা ২৫.৩% ভাগ থেকে ৪০% ভাগে উন্নীত করাসহ ২০০০ সাল নাগাদ NRR-1 অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)। বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ পর্যায়ে কমে ২.১১%এ, স্থূল জন্মহার ৩৪.৫এ, স্থূল মৃত্যুহার ১৩.৪এ, প্রজনন হার ৪.৩ এ, শিশুমৃত্যু হার ১১০ জনে (প্রতি হাজারে) এবং সন্তান কামনার গড় ৪.১ থেকে কমে ২.৯ এ হ্রাস পায় (আক্তারুজ্জামন, ২০০০)। সরকারীভাবে দৃঢ় অঙ্গীকার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রমের ধনাত্মক ফলাফল দেখা যায় বলে ধারণা করা হয়।

**নবম পর্যায় ঃ নিবিড় সেবাদান পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম (১৯৯০-৯৫)**

এ সময়কালে কার্যক্রমকে আরো ব্যাপকভিত্তিক ও চাহিদা উপযোগী করে সাজানো হয় এবং মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদান অবকাঠামো বিস্তারকরণ অব্যাহত থাকে। মাঠকর্মীদের তথ্য, শিক্ষা ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং কাউন্সেলিং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। মা ও শিশুর মৃত্যুরোধে জরুরী প্রসূতি সেবার প্রচলন করা হয় এবং নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার করা হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি হিসাবে স্বল্পপরিসরে নরপ্লান্ট পদ্ধতির প্রচলন করা হয় এবং পরিবার কল্যাণ-সহকারীদের মাধ্যমে বাড়ীতে ক্লায়েন্টকে (ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি) ইনজেকশন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্ধ্যাকরণ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ কেন্দ্র খোলা হয়। পুরুষদের এবং নবদম্পতিদের পদ্ধতিগ্রহীতা হিসেবে উদ্বুদ্ধকরণের প্রতি বিশেষ জোর দেয়া হয়। ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি গ্রহণের হার বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ক্লিনিক্যাল পদ্ধতির গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন টীমের কার্যক্রম বিস্তৃত করা হয়।

এ পর্যায়ে জনমিতিক লক্ষ্যমাত্রায় স্থূল জন্মহার ৩৭.৫ থেকে কমিয়ে ৩০.১-এ, স্থূল মৃত্যুহার ১৩.৪ থেকে কমিয়ে ১১.৯-এ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৬ থেকে কমিয়ে ১.৮ এ, প্রজনন হার ৪.৩ থেকে কমিয়ে ৩.৪-এ, শিশুমৃত্যু হার ১১০ (প্রতি হাজারে) থেকে কমিয়ে ৮০তে, মাতৃ মৃত্যুহার ৫.৭ থেকে কমিয়ে ৪.৫ এ এবং পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার শতকরা ৩৯.২% থেকে ৫০%-এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

বিভিন্ন জরিপে এ পর্যায়ে অর্জিত অগ্রগতিতে দেখা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ সময়ে ১.৮১%-এ (BBS-95) এবং প্রজনন হার ৩.৭-এ নেমে আসে। এ সময়ে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার উল্লেখ্যযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬%-এ উন্নীত হয় (বাংলাদেশ সরকার ২০০০)।

**দশম পর্যায়ঃ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের প্রস্তুতিকাল (১৯৯৫-১৯৯৮)**

১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক

সম্মেলন (ICPD)। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশের আলোকে জনসংখ্যা কার্যক্রমকে প্রজননস্বাস্থ্য পরিচর্যাভিত্তিক করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ সময়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদের জন্য নতুন আঙ্গিকে কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রজননস্বাস্থ্য পরিচর্যার সকল উপাদানকে সম্পৃক্ত এবং সেবা প্রদানের নতুন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে ৫ বছর মেয়াদী (১৯৯৭-২০০২) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

## একাদশ পর্যায়ঃ স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম-৫ (১৯৯৮-২০০৩)

এ সময়ের জন্য ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করে নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের এ কৌশল অর্থাৎ Health and Population Sector Strategy ইতোমধ্যেই সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। এ কৌশলের ভিত্তিতে ১৯৯৮ এর জুলাই মাস থেকে ৫ বছর মেয়াদী স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম-(HAPP-5) বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার কর্তৃক গ্রহীত Health and Population Sector Srategy-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলোঃ ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে ২০০৫ সালের মধ্যে NRR-1 অর্জন ও জনউর্বরতা অর্থাৎ মহিলাদের গড় সন্তান ধারণ ক্ষমতা হ্রাসকরণ (বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮)। এ লক্ষ্যে আগামী পরিবার পরিকল্পনা রূপরেখায় প্রস্তাবিত "অত্যাবশ্যকীয় সেবাদান প্যাকেজের" আওতায় পরিবার পরিকল্পনা সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বর্তমানের দুর্বলতাসমূহকে চিহ্নিত করে সেবাদানের কৌশল, মাত্রা ও মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এক প্যাকেজ কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে।

## HAPP-5-এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ

জনউর্বরাত ও মৃত্যুহার কমিয়ে আনার জোরদার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা;

শিশু এবং মাতৃমৃত্যু ও রোগ-ব্যাধি হ্রাস করা;

মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া সংক্রামক ব্যাধিসমূহের প্রকোপ হ্রাস করা।

## HAPP-5-এর মূলদিকসমূহ

অত্যাবশ্যকীয় সেবা ব্যবস্থাঃ উচ্চ গুণসম্পন্ন, ক্লায়েন্ট-কেন্দ্রিক, গ্রহীতার-গুরুত্ব নির্ভর, কার্যকর এবং দক্ষ সেবাদান;

গ্রহীতার পছন্দানুযায়ী একই স্থানে সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা;

ফলাফলের ওপর গুরুত্বারোপ এবং পরিবীক্ষণ সূচকের ব্যবহার;

সামাজিক অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ;

ব্যয়-সাশ্রয় এবং দক্ষতা;

কর্মসূচির দীর্ঘমেয়াদী ধারণযোগ্যতা;

সরবরাহ বিকেন্দ্রীকরণসহ বেসরকারী ও ব্যক্তিগত খাতের অংশগ্রহণ;

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে মনোযোগ বৃদ্ধিকরণ;

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

## অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ (ইএসপি)

১। প্রজননস্বাস্থ্য ঃ পরিবার পরিকল্পনা ঃ ক্লিনিক্যাল এবং নন-ক্লিনিক্যাল, প্রসব-পূর্ব পরিচর্যা, প্রসব-পরববর্তী পরিচর্যা, নিরাপদ প্রসব, টিটি, আরটিআই/এসটিডি, এইচআইভি/এইড্স তথ্য, গর্ভপাত পরববর্তী জটিলতা ব্যবস্থাপনা এবং জন্মরোধ, বন্ধ্যাত্ব এবং মায়ের পুষ্টি।

২। শিশুস্বাস্থ্য ঃ শিশুর রোগ-প্রতিরোধক টিকা, এআরআই প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ, ডায়রিয়া প্রতিবোধক এবং নিয়ন্ত্রণ, ভিটামিন-এ ঘাটতিপূরণ, হাম নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা, অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ, আয়োডিনের ঘাটতিপূরণ এবং শিশুর অসুস্থতা দূরীকরণে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিকে শিশু স্বাস্থ্য সেবার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম হিসেবে গণ করা হয়।

৩। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ যক্ষ্মা, মালেরিয়া এবং কুষ্ঠ ও কালাজ্বর প্রভৃতি এ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪। রোগ নিরাময় পরিচর্যা

৫। আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ (BCC) এবং তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (IEC)।

## ভবিষ্যত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ

**নবদম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার বৃদ্ধি করাঃ** পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রতি বছর দেশে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ বিয়ে হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা বিয়ের প্রথম বছরেই সন্তান ধারণ করেন। এদের বেশীর ভাগেরই বয়স ২০ এর নীচে। অথচ ২০ বছরের আগে সন্তান ধারণ ও জন্মদান মা ও শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নববিবাহিত দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর আওতায় আনতে পারলে যেমন মা ও শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে তেমনি অবাঞ্ছিত জন্মরোধ করা সম্ভব হবে–যা দুসন্তানের সার্বজনীন পরিবার কাঠামো গঠনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

**কম বয়সী ও কম সন্তানের দম্পতিদের মধ্যে পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাঃ** দেশে বর্তমানে ১ কোটি ১৮ লক্ষ সক্ষম দম্পতি পদ্ধতি ব্যবহার করছেন (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)। এদের মধ্যে বেশীর ভাগের বয়স ত্রিশ উর্ধ্ব এবং সন্তান সংখ্যা দুয়ের বেশী। তাই কম বয়সী এবং কম সন্তান সংখ্যা বিশিষ্ট দম্পতিদের পদ্ধতি ব্যবহারের আওতায় আনার বিষয়ে গুরুত্বরোপ করা হচ্ছে।

**অপূর্ণ চাহিদা পূরণ ঃ** ১৯৯৬-৯৭ সালে অনুষ্ঠিত এক জরিপে দেখা গেছে, দেশে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে ১৬ শতাংশের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে তাদের কাছে সেবা পৌঁছায় না। এ দম্পতিদের চিহ্নিত করে দ্রুত পদ্ধতি ব্যবহারের আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

**ড্রপ আউট ঃ** পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, সঠিক পরামর্শ প্রদানের অপ্রতুলতা, গুজব ও বিভিন্ন কারণে অনেক সময় পদ্ধতি ব্যবহারকারীগণ পদ্ধতি ব্যবহার ছেড়ে দেন, তাই ড্রপআউট ক্লায়েন্টের পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়ার কারণ চিহ্নিত করে তার সমস্যা

সমাধানের সহায়তা করে পরামর্শদানের মাধ্যমে পুনরায় গ্রহীতা করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

**সেবার মান উন্নয়ন ঃ** সেবার মান উন্নয়ন ও বিদ্যমান সেবা ব্যবস্থার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং জনগণকে সেবা গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।

**পুরুষদের পদ্ধতি ব্যবহারকারী হিসেবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ঃ** ছোট ও সুখী পরিবার গড়া এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ভয়াবহ পরিণতি থেকে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রধানত মহিলারাই বহন করছেন, কারণ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতাদের মধ্যে মাত্র ১০ ভাগ হচ্ছে পুরুষ; পুরুষদের জন্য পদ্ধতি মাত্র দুটি হলেও পুরুষ পদ্ধতি মহিলাদের পদ্ধতি অপেক্ষা সহজ ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া মুক্ত। তাই পুরুষরা পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের স্ত্রীকে গর্ভধারণের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে পারেন সহজেই। এ কারণেই পুরুষদের পদ্ধতি গ্রহণের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ছোট পরিবার গঠনে সরাসরি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে আগ্রহী করার বিষয়টি জোরদার করা হচ্ছে।

**বিলম্ব বিবাহ ঃ** যুবক-যুবতীদের বিলম্ব বিবাহের প্রতি আগ্রহী করা হচ্ছে। বিলম্ব বিবাহের ফলে অনেক জন্মরোধ করা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র বিলম্ব বিবাহের কারণে ১৯৭১-১৯৯১ সালের মধ্যে প্রায় ৯ লক্ষ জন্মরোধ করা সম্ভব হয়েছে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

**স্বল্প অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় কার্যক্রমে জোরদার করাঃ** দেশের ছয়টি বিভাগের মধ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম, এই দুটি বিভাগে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে নতুন মাত্রা যোগ হবে। তাই নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ও সেবা প্রদান কার্যক্রম জোরদার করার প্রতি গুরুত্বরোপ করা হচ্ছে।

মেয়ে শিশু ও মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। বস্তি এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ ও সেবা প্রদান কর্মসূচি জোরদার করা। মাঠকর্মীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন। জন্মরোধ ছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির

অন্যান্য কল্যাণকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করা, যেমন ঃ পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশুর জীবন বাঁচায়; পরিবার পরিকল্পনা প্রতিটি দম্পতির অধিকার ইত্যাদি।

**কার্যক্রমের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা ঃ** আগামীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সক্ষম দম্পতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। এদের শতকরা ৭০ ভাগ দম্পতিকে সেবা ব্যবস্থার আওতায় আনা ও সেবা প্রাদন অব্যাহত রাখার জন্য যে বাড়তি সম্পদের প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করার বিষয়ে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বৈদেশিক নির্ভরতা ক্রমে হ্রাস করে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

## পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার বর্তমান অবকাঠামো

বাংলাদেশের সরকারী পর্যায়ের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ১৯৬৫-১৯৯৮ এই দীর্ঘ ৩৩ বছরে পথ পরিক্রমণ করে বর্তমানে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমণে কর্মসূচিকে বার বার প্রয়োজন ও চাহিদার উপযোগী করে সাজানো হয়েছে। পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সেবা অবকাঠামোর বিস্তার এবং মাঠ পর্যায়ে প্রায় ৩০ হাজার মহিলা মাঠকর্মীর নিয়োগ জনগণের মাঝে সেবাকে সহজলভ্য করেছে যা কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায় নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

জেলা পর্যায় ঃ জেলা পর্যায়ে রয়েছে হাসপাতাল। এ ছাড়া ৫৫টি জেলা সদরে রয়েছে মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। এর ২৯টি জেলায় মা ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং জরুরী প্রসূতি পরিচর্যা সেবা চালু করা হয়েছে।

থানা পর্যায় ঃ প্রতিটি থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে "পরিবার এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য ইউনিট" রয়েছে। এছাড়াও ১১টি থানায় রয়েছে মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র।

ইউনিয়ন পর্যায় ঃ দেশের প্রায় ৩২০০ ইউনিয়নে "ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ কেন্দ্র" নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে কেন্দ্র নির্মিত হয়নি, সেখানে ভাড়া বাড়ীতে বা রুর‍্যাল ডিসপেনসারির মাধ্যমে সেবা দেওয়া হয়। এসব কেন্দ্রে একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, একজন চিকিৎসা সহকারীসহ আরও কয়েকজন কর্মী জনগণকে সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করছেন। এসব কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সাধারণ রোগের চিকিৎসা এবং পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সকাল ১০টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত এ সকল কেন্দ্র খোলা থাকে। জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার রোগীকে এসব কেন্দ্র থেকে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া ২৪টি ইউনিয়ন রয়েছে মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র। দেশে বর্তমানে প্রায় ৫ হাজার পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কাজ করছেন।

ইউনিট পর্যায় ঃ একটি ইউনিয়নকে লোকসংখ্যা অনুসারে ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী ৫০০ থেকে ১০০০ সক্ষম দম্পতিকে বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও পাশাপাশি সেবা প্রদান করছেন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক ঃ সম্প্রতি ইউনিয়নে মাসে ৮টি করে স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি ইউনিয়নকে ৩টি সমান ভাগে ভাগ করে যে ভাগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে সে ভাগে মাসে ২টি এবং অন্য ২টি ভাগে ৩টি হিসাবে ৬টি অর্থাৎ মোট ৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এলাকার কোন বাড়ী, স্কুল বা সুবিধাজনক স্থানে এই স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সকল ক্লিনিকে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, গর্ভবর্তী মাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং শিশুদের টিকা দেওয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানে স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

## মাঠ পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী মাঠকর্মী

পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ঃ এদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। এরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সোব প্রদানের দায়িত্ব পালন করছেন। এরা সকলেই মহিলা মাঠকর্মী।

পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ঃ দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে রয়েছেন একজন করে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক। এদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। ওয়ার্ড পর্যায়ে কর্মরত পরিবার কল্যাণ সহকারীদের কাজের তদারকী করা এবং পুরুষদের পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই এদের মূল দায়িত্ব। এরা সকলেই পুরুষ মাঠকর্মী।

পরিবার কল্যাণ সহকারী ঃ দেশে বর্তমানে সাড়ে ১৩ হাজার পরিবার কল্যাণ সহকারী রয়েছেন, এসকল মাঠকর্মী বাড়ী বাড়ী গিয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং সেবা দিচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত ধাত্রী ঃ মা ও শিশুর অকাল মৃত্যুরাধ করার জন্য নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে একজন করে ধাত্রীকে নিরাপদ ও বিজ্ঞান সম্মত প্রসব ব্যবস্থার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার ধাত্রীকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে এবং তাদের নিরাপদ প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্বলিত কীট (Safe delivery kit) সরবরাহ করা হয়েছে।

### সেবার ধরন

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা কেন্দ্র এবং সেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করা হয়ঃ

ক) পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সক্ষম দম্পতিদের এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে মায়েদের উদ্বুদ্ধকরণ;

খ) সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সেবা প্রদান;

গ) গর্ভবর্তী, প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা; এবং

ঘ) নবজাতক ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

### পরিবার পরিকল্পনা গর্ভনিরোধক উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা

পরিবার পরিকল্পনা সার্বিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে গর্ভনিরোধক উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থা। সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থার উপর কার্যক্রমের অগ্রগতি

অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সময়মত গর্ভনিরোধক উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় গর্ভনিরোধক সামগ্রী বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ও ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় সংগ্রহ করা হয়। বন্ধ্যাকরণের কিছু সামগ্রী স্থানীয়ভঅবে সংগ্রহ করা হয় এবং সকল দ্রব্যসামগ্রী কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে সংরক্ষণ করা হয়। বিদেশ থেকে দ্রব্য-সামগ্রীর বেশিরভাগ সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে খালাস হওয়ার পর তা চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পণ্যাগারে জমা হয় এবং পরবর্তীতে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে স্থানান্তর করা হয়। বিমানযোগে আসা পণ্য ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে জমা হয়। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পণ্যাগারে সংগৃহীত সকল গর্ভনিরোধক সামগ্রী তিনটি বিভাগে অবস্থিত তিনটি আঞ্চলিক পণ্যাগারে, ১৮টি জেলা সংরক্ষণ পণ্যাগারে এবং ৪৬৭টি থানা ষ্টোরে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল ষ্টোর থেকে চাহিদা মোতাবেক এবং যথাসময়ে গর্ভনিরোধক উপকরণ মাঠপর্যায়ে কর্মরত এফ ডব্লিউ এ, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে উপকরণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চাহিদা এবং বিতরণের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হলে তা অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে, আবার চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত সরবরাহ করা হলে অপচয় হবে বা অন্য জায়গায় ঘাটতি সৃষ্টি করবে। উপকরণের সুষ্ঠু সরবরাহ ব্যবস্থার পাশাপাশি সংরক্ষণ ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেন্দ্রীয় পণ্যাগার থেকে মাঠকর্মী পর্যন্ত সামগ্রী পৌঁছানোর যে পাঁচটি স্তর আছে এবং প্রতিটি স্তরেই চলতি মজুদ হিসেবে ৩ (তিন) মাসের গর্ভনিরোধক উপকরণ মজুদ রাখার বিধান রয়েছে। কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সরবরাহ এবং মজুদের প্রতিটি স্তরেই মালামালের প্রাপ্তি, বিতরণ, ব্যবহারের মেয়াদ ও উপযুক্ততা বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

## তথ্য ব্যবস্থাপনা

মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে তথ্য সুষ্ঠুভাবে

সংরক্ষণের জন্য পরিবার কল্যাণ রেজিষ্টার-এর প্রবর্তন করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ সহকারী বাড়ী বাড়ী পরিদর্শনের সময় রেজিস্টার সাথে নেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। এ রেজিস্টারে দম্পতির পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, সন্তান সংখ্যা, সন্তানের জন্ম-মৃত্যু, ব্যবহৃত পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির নাম, ব্যবহারের মেয়াদ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রেও পরিবার পরিদর্শিকা এসব তথ্য লিপিবদ্ধ করেন এবং পরিবার কল্যাণ সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তাদের কাজের অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে পেশ করেন। এভাবে অগ্রগতির প্রতিবেদন ইউনিয়ন থেকে থানা, থানা থেকে জেলা, জেলা থেকে অধিদপ্তরের এম আই এস ইউনিটে প্রেরণ করা হয়।

এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম) ইউনিট প্রতিমাসে সরকারী, বেসরকারী, সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী এবং বহুমুখী সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত সেবা প্রদানের প্রতিবেদন সংকলন ও প্রণয়ন করে থাকে। এ প্রতিবেদনে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পদ্ধতি ভিত্তিক গ্রহণকারী ও ব্যবহাকরারী সংখ্যা; বয়স ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণকারী ও ব্যবহাকারীর সংখ্যা এবং ড্রপ-আউট বিষয়ে তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

## পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত সকল তথ্যের সত্যতা য়াচাই করার জন্য জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে তদারকি দল নিয়মিতভাবে মাঠ পরিদর্শন করে থাকেন। পরিবীক্ষণদল সাম্প্রতিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদনের মান এবং সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করে থাকেন (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

## কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য

নিরক্ষরতার উচ্চহার, জীবনমান সম্পর্কে অসচেতনতা, দারিদ্র্য, মেয়েদের নিম্ন মর্যাদা প্রভৃতি প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যেও বাংলাদেশে পরিবার

পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। অর্জিত সাফল্যগুলো হচ্ছেঃ

- ১৯৭৫ থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি বছর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারী শতকরা গড়ে ২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার ১৯৭০ এর ৩ ভাগ থেকে ১৯৯৮-এ ১.৬-এ নেমে এসেছে (বিবিএস ১৯৯৬-৯৭);
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতা হার ১৯৭৫-এর ৭ ভাগ থেকে ১৯৯৮ সনে প্রায় ৫০ ভাগে উন্নীত হয়েছে;
- প্রজনন হার বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার মধ্য ৭০ দশকের ৬.৩ থেকে ১৯৯৭ সনে ৩.৩-এ হ্রাস পেয়েছে।
- কাঙ্ক্ষিত সন্তান সংখ্যা ১৯৭৫ এর ৪.১ থেকে ১৯৯১ সে ২.৫-এ নেমে এসেছে;
- নবজাতকের মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে) ১৯৭৫-এর ১৫০ থেকে ১৯৯৭-এ ৭২-এ নেমে এসেছে;
- অপূর্ণ চাহিদা (Unmet need) ১৯৯৩-৯৪ সালে ১৯ শতাংশ যা বর্তমানে ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে;
- মাতৃ মৃত্যুহার ১৯৮২ এর ৬.২ থেকে ১৯৯৩-এ ৪.২ নেমে এসেছে;
- সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অবহিতির হার প্রায় একশত ভাগ;
- প্রবল সামাজিক এবং ধর্মীয় বাধা হ্রাস;
- ঝুঁকিপূর্ণ জন্মদানের সংখ্যা কমে যাওয়ার এক হিসেবে দেখা গেছে, ১৯৭১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ২৮ লক্ষ শিশু মৃত্যু এবং ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার মায়ের মৃত্যু এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং ১ কোটি ৬০ লক্ষ জন্মরোধ করা সম্ভব হয়েছে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

## কর্মসূচির সম্ভাবনাময় সাফল্যে শক্তি ও ক্ষেত্রসমূহ

পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আগামী

দশকে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দেশে ইতোমধ্যে সৃষ্ট সেবা অবকাঠামো, বিদ্যামন জনবল ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহ ভবিষ্যত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইংগিত বহন করে। যেমন ঃ

ক) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের (কর্মসূচির প্রতি) সমর্থনঃ জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অঙ্গীকার রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য রয়েছে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ। দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থনের ফলে কর্মসূচির প্রতি বিভিন্ন বাধা প্রায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। এটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে অনুকূল পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করেছে;

খ) মাঠ পর্যায়ে কর্মী ঃগ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর জন্য দেশব্যাপী থানা ও গ্রাম পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক মাঠকর্মী রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রায় ৪৫ হাজার মাঠকর্মী বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছে;

গ) জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক সেবা অবকাঠামো ঃ জেলা পর্যায়ে মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, থানা পর্যায়ে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং রুরাল ডিসপেনসারি ও ভাড়া করা ক্লিনিক সেবাদানের স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান। তাছাড়া, সারা দেশে প্রতি মাসে ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিক কাজ করছে। এভাবে দেশে স্থায়ীভাবে প্রায় ৩৫ হাজার সেবা কেন্দ্র থেকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে;

ঘ) ক্রমবর্ধমান তুষ্ট (Satisfied) গ্রহীতা ঃ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের সাথে সাথে দেশে তুষ্ট গ্রহীতার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে;

ঙ) সমাজ নেতাদের সমর্থন ঃ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সমাজ নেতাদের সমর্থন ও সংগঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন;

চ) মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতা ঃ স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মীগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা তথা পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও

শিশুস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে, তবে এ সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে;

ছ) তথ্য মন্ত্রণালয় কার্যক্রম ঃ জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা বিবেচনা করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন ঃ তথ্য মন্ত্রণালয় তাদের আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের দ্বারা উপযোগী জনসংখ্যা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যা জাতীয় কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করছে;

জ) দাতা সংস্থা বা উন্নয়ন অংশীদারদের সমর্থন ঃ কর্মসূচির সফলতার কারণে পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা তথা উন্নয়ন অংশীদারদের জোরালো সমর্থন অব্যাহত রয়েছে।

## কার্যক্রমের অধিকতর অগ্রগতির জন্য অন্যান্য সহায়ক ক্ষেত্রসমূহ

পরিবার পরিকল্পনার প্রতি দ্রুত সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নারী শিক্ষার প্রসার, নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রজনন বিষয়ে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। দেশে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ কর্মসূচী, মহিলাদের অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে। শিক্ষার সুযোগ মেয়েদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের সচেতন করবে এবং বাল্য বিবাহ রোধে সহায়ক হবে। এসকল যোগ্যতা নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, পরিবার ও সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে- যা প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিকেও নিম্নমুখী করবে।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে দেশে ব্যাপক প্রচারণার কাজ চলছে, মাঠকর্মীরাও পরামর্শ দেওয়ার সময় মায়েদের এ বিষয়ে সচেতন করার কাজ করছেন। সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে গর্ভধারণের আশংকা কম থাকে; এ জন্য সন্তানের বয়স ২ বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ালে অনেক জন্মরোধ করা সম্ভব হবে।

পুষ্টি বিষয়েও দেশে সচেতনতা সৃষ্টির জোরদার প্রয়াস চলছে। পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ মা ও শিশুকে সবল রেখে তাদেরকে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে রক্ষা করবে।

শিশুর বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, অধিক সন্তান আকাঙ্ক্ষা ও অধিক সন্তান জন্মগ্রহণের হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

## পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ফলে ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক ফলাফল

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রভাব বেশ কিছু সংখ্যক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান। প্রজনন হারের ওপর পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ইতিবাচক প্রভাবের ফলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হার কমিয়ে এনে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। মোট প্রজনন হার ১৯৭২ সালের পর্যায়ে যদি ৬.৩-এ স্থির থাকত, তাহলে ১৯৯৪ সালে খাদ্যের ঘাটতি ১৬ লক্ষ টনের স্থলে ৪৪ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়াত। একইভাবে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধিহার বার্ষিক ২.৪০ এর স্থলে ০.৫১-এ স্থির থাকত (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

ব্যয় ও লাভের অনুপাত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, পরিবার পরিকল্পনা খাতে প্রতি ১০০ টাকা বিনিয়োগ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫.০০ টাকা বিনিয়োগজনিত সাশ্রয় পাওয়া সম্ভব এবং এই সাশ্রয় অন্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে সে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের মান বৃদ্ধি করা সম্ভব; এর ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে দাতাসংস্থার ওপর নির্ভরশীলতাও বহুলাংশে কমানো সম্ভব। অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে এ ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। অভিখাতসমূহ (Interventions) জোরদার করে ২০০৫ সাল নাগাদ মোট প্রজননহার ২.২ অর্জন করা সম্ভব হলে প্রতি ১০ জন পূর্ণবয়স্ক কর্মক্ষম লোকের উপর নির্ভরশীল সন্তানের বর্তমান সংখ্যা ৭ থেকে ৪-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং কেবলমাত্র স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ এবং গৃহায়ন খাতেই ৪৯.০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সাশ্রয় অর্জন করা সম্ভব হবে (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

## পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম সাফল্যের কারণসমূহ

সাফল্যের পেছনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হচ্ছে ঃ

(১) বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে-এক নম্বর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা;

(২) সরকারী প্রচার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা;

(৩) এ কার্যক্রমের প্রতি অব্যাহত সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার;

(৪) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সেবা অবকাঠামো নির্মাণ;

(৫) বিশাল মাঠকর্মীদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সক্ষম দম্পতিদের ছোট পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করা;

(৬) সেবা গ্রহীতাদের নিকট নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ও জরুরী ঔষধপত্র পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৭) কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ব্যাপক অংশগ্রহণ;

(৮) এ খাতে ক্রমাগত সরকারী অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা;

(৯) এ কর্মসূচিকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা; এবং

(১০) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাথে মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা সম্পৃক্তকরণ (আক্তারুজ্জামান, ২০০০)।

## উপসংহার

পরিবার পরিকল্পনা একটি জন-সম্পর্কিত কর্মসূচি। জনসম্পর্কিত যে কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। কোন কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নির্ভর করে সেই কর্মসূচির প্রতি তাদের সমর্থনসূচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনসূচক পরিবর্তন সাধনে সমাজের নেতৃবৃন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। সে হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির স্বার্থক বাস্তবায়নে সরকারের প্রচেষ্টার সাথে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সমন্বিত হওয়া দরকার। সমাজে নেতৃস্থানীয় লোক বলতে বুঝায় শ্রমিক নেতা, মসজিদের ঈমাম, সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের নিকট সম্মানিত ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিবর্গ। যতদিন পর্যন্ত দেশের সকল লোক বিশেষ করে মহিলা ও যুব সমাজ এই সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন

হয়ে এর সমাধঅনের জন্য মিলিতভাবে সচেষ্ট না হবেন, ততদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হবে না। কাজেই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীর নয়, এই দায়িত্ব আপনার, আমার ও দেশের প্রত্যেক নাগরিকের।

## তথ্য নির্দেশিকা

আলম, বিলকিস আরা ও আজম, কে, কিউ (সম্পাদিত) (১৯৮৭) *ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েল।* ঢাকাঃ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট।

আক্তারুজ্জামান, মোঃ (২০০০) *বাংলাদেশের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম* (অপ্রকাশিত) ঢাকা।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৯ থেকে ১৯৯৮) *পরিসংখ্যান বর্ষপঞ্জি* ঢাকা ঃ বিবিএস।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৭৯) *বাংলাদেশ পরিসংখ্যাণ পকেট বই ১৯৯৯।* ঢাকা ঃ বিবিএস।

বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৮) *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,* ১৯৯৭-২০০০। ঢাকা ঃ পরিকল্পনা কমিশন।

বাংলাদেশ সরকার (২০০০) *বাংলাদেশের জনসংখ্যা কার্যক্রম* (২০০০)। ঢাকা ঃ বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

সালাহ উদ্দীন, এ, টি, এম (১৯৮৬) *আধুনিক জনবিজ্ঞান।* ঢাকা ঃ বুক হাউস।